পথদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ

অনির্বাণ রায়

ছবি

পার্থ সেনগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-2016-5

প্রথম প্রকাশ : 1997 (শক 1919)
চতুর্থ মুদ্রণ : 2002 (শক 1923)

মূল্য : 11.00 টাকা

Pathadrashta Swamy Vivekananda *(Bangla)*
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110 016 কর্তৃক প্রকাশিত

১

সবে মাত্র পনেরোয় পড়েছে ছেলেটা।

অথচ এই বয়সে কিছুই তার ভালো লাগে না। খেলার মাঠে যায় না।

বন্ধুদের সঙ্গে ভালো করে মেশে না।

একলা কাটায়।

কী যে হয়েছে তার ভালো করে সেটা বুঝে উঠতে পারে না।

পাশের বাড়িতে থাকেন এক আত্মীয়। শহরে নতুন এসেছেন।

ছেলেটা সেই আত্মীয়ের বাড়ি প্রায়ই যায়। তাঁদের বাড়ির বইপত্র নাড়াচাড়া করে। দেখে।

এইরকম একদিন দেখতে গিয়ে একজনের লেখা একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল।

পড়ার পর?

সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঠিক এইরকম জিনিসই তো সে খুঁজে মরছিল। এই বইগুলো আমাকে কদিনের জন্য পড়তে দেবেন?

তা নিয়ে যাও না।

ছেলেটা বইগুলো বাড়ি নিয়ে এল।

তারপর?

দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মাসের পর মাস পাগলের মতো পড়ে যায় ছেলেটা।

পড়ে আর ভাবে।

ভাবে আর ভাবে।

ভাবে, ওই বইগুলো থেকে যে-শিক্ষা সে পেল, যে-আলো সে পেল, তাতে বাকি জীবনটা দেশের জন্য ঢেলে দিতে পারে।

ছেলেটা, পনেরো বছরের সেই ছেলেটা, সেদিন ঠিকই ভেবেছিল।

দেশের পায়ে সঁপে দিয়েছিল সমস্ত জীবন।

ছেলেটা কে?

দেশ তাকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নামে চেনে। আর, যাঁর লেখা পড়ে তাঁর জীবনটা এমন বদলে গেল, তিনি?

তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু, স্বামী বিবেকানন্দ তো কারো নাম হতে পারে না। এ থেকে তাঁর বাবা-মা বা অন্য কারো বিষয়ে কিছু জানা যাবে না।

তাহলে উপায়?

পিছিয়ে যেতে হবে দেড়শো বছর আগেকার কলকাতায়।



২

তখন কলকাতা শহরে স্যাকরা গাড়ি ছুটছে ধুলো উড়িয়ে। হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে পড়ছে চাবুক। তখন না ছিল বাস, না ট্রাম, না ছিল মোটর-গাড়ি।

তখন জলের কল বসেনি। কাঁখে করে কলসী ভরে জল আনতে হত বাইরে থেকে।

তখন শহরে না ছিল গ্যাসবাতি, না বিজলি বাতি। তা সেই দেড়শো বছর আগে দত্ত পরিবার গুপ্তিপাড়া থেকে এসে প্রথমে বসতি করেন গোবিন্দপুরে। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি নতুন দুর্গ তৈরি করার পরিকল্পনা করলে দত্ত পরিবার চলে আসেন উত্তর কলকাতার সুতানুটি অঞ্চলে। চার-পাঁচ বিঘে জমি নিয়ে তাঁরা নতুন বসতি করলেন সিমলায়।

পরিবারের কর্তা রামমোহন দত্ত ছিলেন উকিল। ওকালতি করে আয়ও করেছিলেন প্রচুর। রামমোহনের ছেলে দুর্গাচরণ। তিনিও ছিলেন উকিল। আইন ছাড়া তিনি জানতেন সংস্কৃত আর পারসী। আর জানতেন কাজ চালাবার মতো ইংরেজী। বাপের মতো দুর্গাচরণও প্রচুর আয় করেছিলেন ওকালতি ব্যবসায়। তবে তাঁর বড়োলোকীপনা ছিল না। ধর্মে মতি ছিল। ধর্মশাস্ত্র পড়তেন। সাধুসঙ্গ করতেন। এইরকম সাধুসঙ্গ করতে করতে পঁচিশ বছর বয়সে একদিন বৌ আর একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথকে ফেলে রেখে দুর্গাচরণ সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

বড়ো হয়ে বিশ্বনাথও বাপ-ঠাকুর্দার মতো উকিল হয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন। বৌয়ের নাম ভুবনেশ্বরী। ধর্মের জন্য ভুবনেশ্বরীর প্রাণ কাঁদত। ঠাকুর-দেবতায় অসম্ভব বিশ্বাস।

বিশ্বনাথ-ভুবনেশ্বরীর ছেলে বীরেশ্বর।

১৮৬৩-র ১২ জানুয়ারি বীরেশ্বরের জন্ম। অন্নপ্রাশনের দিন তার আর একটা নাম রাখা হয়েছিল। নরেন্দ্র। এই নরেন্দ্রই বড়ো হয়ে হল বিবেকানন্দ। কিন্তু বড়ো তো আর একদিনে হওয়া যায় না। বড়ো যদি হতে চাও ছোট হও তবে।

ছোটবেলায় কী যে দুরন্ত ছিল বীরেশ্বর, ওই যার ডাক নাম বিলে।

এটা ভাঙছে। ওটা ছুঁড়ছে। এলোমেলো তছনছ করে দিচ্ছে সব।

প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে মারছে যাকে পাচ্ছে হাতের কাছে।

'আচ্ছা মা, ভাতের থালা ছুঁয়ে গায়ে হাত দিলে কী হয়?'

'বাঁ হাতে গেলাস তুলে জল খেয়ে হাত ধোয় কেন?'

মা বলেন, জানি নে বাপু।

বাবা বিশ্বনাথ দত্তই বা বাদ যান কেন। মস্ত উকিল তিনি। দেখতে সুন্দর। তবে বেহিসেবী-রকম উদার মানুষ।

মনটা ছিল রাজার মতো। মনের সেই রাজবাড়িতে জড়ো হয়েছিল দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি। অনেকগুলো ভাষা জানতেন।

হিন্দু, কিন্তু মুসলমানী আচারের বড়ো ভক্ত। ভাগবতে ভক্তি ছিল। বাইবেলেও ছিল। ভালোবাসতেন কবিতা। গান। বৈঠকখানায় তাঁর কাছে নানারকম মানুষ আসে। নানা জাতের।

তাদের জন্য ঝোলানো থাকে সার সার হুঁকো। এটা বামুনের। এটা মুসলমানের। এ যদি ওরটাতে মুখ দেবে তো জাত যাবে।

জাত যাবে? জাত আবার হাওয়া-বাতাস নাকি যে যাবে। কৌতূহল হল বিচ্ছু বিলের।

একদিন বাবার বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ে টানতে লাগল হুঁকো। একবার এটা। আর-একবার ওটা। এদিকে কখন যে বিশ্বনাথ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন,

বিলে টেরও পায়নি।

'হ্যাঁ রে, কী করছিস?'

'দেখছি কী করে জাত যায়।'



বাড়ির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইস্কুল। মেট্রোপলিটান ইনসটিটিউশন। বিলেকে সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন বিশ্বনাথ।

পড়ালেখায় বিশেষ মন নেই বিলের। সারাদিন শুধু দুষ্টুমি আর দস্যিপনা।

কেউ ঝগড়াঝাঁটি করছে নিজেদের ভেতরে। মাঝখান থেকে বিলে গিয়ে সব ঠিক করে দিল। বন্ধু অন্ত প্রাণ।

একবার কী হল।

ক্লাসে মাস্টার পড়াচ্ছে আর বিলেরা যে-যার গল্প করছে। রেগেমেগে মাস্টার পড়া ধরতেই সকলে চিত্তির।

'দাঁড়াও সব বেঞ্চির ওপর।'

আর বিলে?

'এই বিলে, তুই বল্।'

বিলে গড়গড়িয়ে বলে যায় সব পড়া। মাস্টার তো হতবাক।

'ঠিক আছে। তুই বোস।'

বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে, বিলে একা বসবে। তাই আবার হয় না কি। বিলেও বন্ধুদের সঙ্গে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে রইল।

খেলাধুলোয় খুব উৎসাহ বিলের। শরীরের দিকে বেশ নজর। ছোটবেলা থেকে সে জানে গায়ে জোর থাকা দরকার। সেজন্য ব্যায়াম করত। নানারকম খেলা খেলত। বক্সিং লড়ে প্রথম হয়ে রুপোর প্রজাপতি পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছিল। ভালো ক্রিকেট খেলতে পারত বলে বেশ নামডাক ছিল তার।

খেলতে গিয়ে কপাল কেটে দাগ হয়েছিল। সে দাগ সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে ছিল।

কোন খেলাটা বিলে বাদ দিয়েছে? ঘুড়ি, লাট্টু, গুলি, দৌড়োদৌড়ি, লুকোচুরি, চোর-পুলিশ, কবাডি, কুস্তি, জিমন্যাসটিক।

নবগোপাল মিত্র—লোকে সে-সময় তাঁর নাম দিয়েছিল ন্যাশনাল মিত্তির—জিমন্যাসটিক শেখাবার আখড়া খুলেছিলেন। বিলে সে আখড়ায় যেত। বারের খেলা শিখত।

একবার হিন্দু মেলায় ব্যায়াম দেখাবার জন্য নবগোপাল মিত্তির তাঁর দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিলেও গিয়েছিল। সে একজন খেলোয়াড়। এদিকে দলের সঙ্গে তাকে দেখে বিলের এক আত্মীয় ধমকাতে লাগলেন, ‘খবরদার বলছি বিলে, খেলবিনে।’

দাদার আদেশ। বিলে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু অন্যরা যখন বারের খেলা দেখাতে লাগল, বিলে কি তখন আর ঠিক থাকতে পারে! সে দৌড়ে বারে উঠে খেলা দেখাতে লাগল। দেখালই শুধু না। বারের খেলা দেখিয়ে বিলে সেবার প্রথম পুরস্কার পায়।

ছোটবেলায় তার যেমন ছিল বুদ্ধি তেমনি সাহস। কলকাতায় সেবার বিলিতি যুদ্ধজাহাজ এসেছে। জাহাজ দেখতে গেলে বড়োসাহেবের অনুমতি লাগে। কুছ পরোয়া নেই।

দরখাস্ত লিখে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বিলে চলল জাহাজ দেখতে।

দরোয়ান তো পুঁচকে ছেলে বলে তাকে বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখাই করতে দেবে না।

দেবে না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

অফিসবাড়ির পেছন দিকে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। তাই দিয়ে তড়বড় করে উঠে গিয়ে সাহেবের অনুমতি নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বিলে। দরোয়ান তো হতবাক।

'তুম ক্যায়সে উপর মে গিয়া থা?'

'হাম জাদু জানতা।'



হ্যাঁ। জাদুই বটে।

ইস্কুলে পড়বার সময় একবার উদরাময় হল বিলের। বিশ্বনাথ

তখন রায়পুরে। শরীর সারাবার জন্য মা আর ভাইবোনদের নিয়ে বিলে চলল রায়পুরে বাবার কাছে।

শরীর সারল। বাবার কাছে বাড়িতেই পড়ালেখা করল। গান শিখল। রান্না শিখল। রান্না? হ্যাঁ। বিশ্বনাথ দত্ত চমৎকার রাঁধতে পারতেন।

তারপর রায়পুর থেকে দু বছর পরে ফিরে এল সকলে। আবার সেই কলকাতা।

কিন্তু ইস্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে মুশকিলে পড়লেন বিশ্বনাথ। নরেন যে পড়ালেখায় পিছিয়ে আছে!

ও এই কথা?

তিন বছরের পড়া এক বছরে সেরে দিল নরেন্দ্রনাথ।

তারপর?

আবার কি! পরীক্ষা দিল ওই এখন যাকে বলে মাধ্যমিক। পাস করল ফার্স্ট ডিভিশনে। বাবার কাছ থেকে পুরস্কার পেল। একটা ঘড়ি।

এবার কলেজ।

কলেজে ভর্তি হবার আগে ওই ইস্কুলে পড়বার সময় একটা কাণ্ড হয়েছিল। ইস্কুলের একজন মাস্টারমশাই চলে যাচ্ছেন। তাকে বিদায় জানানো হচ্ছে। সভায় এসেছেন দুর্দান্ত বক্তা, বিখ্যাত দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই সভাপতি। তিনি তো বলবেনই। ছেলেদেরও তো কিছু বলা চাই। কে বলবে? এ ওকে ঠেলে। সে তাকে ঠেলে। শেষকালে উঠে দাঁড়াল বিলে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দাঁড়িয়ে উঠে আধ ঘণ্টা বলে গেল ইংরেজিতে। প্রথমে

বিদায়ী মাস্টারের গুণবর্ণনা। পরে নিজেদের দুঃখের কথা। মাস্টার ইস্কু ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ভালো কি লাগে তাঁকে ছেড়ে দিতে?

৪

নরেন্দ্রনাথ প্রথম ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রথম বছরে পড়বার সময় হল ম্যালেরিয়া। নরেন্দ্রনাথ কলেজ ছেড়ে দিলেন। পরে আবার ভর্তি হলেন আর-এক কলেজে। নাম জেনারেল এসেম্বলি।

এখানে পড়বার সময় কলেজের একজন মাস্টারমশাই হেস্টির কাছে প্রথম শুনলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম। পরে তাঁকে একদিন দেখলেন প্রতিবেশী সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে। সেটা নভেম্বর মাস।

রামকৃষ্ণ থাকেন দক্ষিণেশ্বরে। নরেন্দ্রনাথ সেখানেও ঘুরে এলেন পরের মাসে।

এইভাবে আসা-যাওয়া চলছে দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে চলছে কলেজে পড়া। এইরকম অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু হল। নরেন্দ্রনাথ তখন বরাহনগরে বন্ধুর বাড়ি গানবাজনা করছেন। বাবার মৃত্যুতে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

ছোট-ছোট ভাইবোন। মা। এতবড়ো সংসার চলবে কী করে। বিশ্বনাথের বন্ধু যারা ছিল সবাই সরে পড়েছে। আত্মীয়-স্বজনরাও খুব একটা সুবিধের নয়। বাড়ির ভাগ নিয়ে তারা মামলা ঠুকে দিল। অন্যায় অসত্যের কাছে কোনোদিনই মাথা নোয়ায়নি নরেন্দ্রনাথ।

এবারও নোয়াল না। আদালতে মামলা উঠল।

বিপক্ষের উকিল নরেন্দ্রনাথকে জেরা করতে লাগলেন। নরেন্দ্রও স্পষ্ট গম্ভীর স্বরে নির্ভয়ে উত্তর দিতে লাগল। মামলায় বিশ্বনাথ দত্তের ব্যারিস্টার বন্ধু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক সাহায্য করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে জজসাহেবও সব বুঝতে পারলেন।

মামলায় তাদেরই জয় হল।

বাড়িটা রক্ষা পেল। খবর শুনে মা ভুবনেশ্বরী নরেনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাড়ি তো বাঁচল। কিন্তু খিদে মিটবে কী দিয়ে?

শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনেছেন নরেন্দ্রর কাছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

শুনে নরেন্দ্রনাথ চুপচাপ বসে থাকেনি। পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছে। বি.এ. পাস করেছে। এটর্নী অফিসে কাজ করেছে।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু। ব্যবসার প্রয়োজনে উপেন্দ্র নরেন্দ্রকে ধরতে সে অনুবাদ করে দিল হারবার্ট স্পেনসারের 'এডুকেশন' নামে বইটা।

এসবের সঙ্গে সংসারের দেখভাল করেছে। আর তার মধ্যেই একদিন দুই বন্ধু—তারক, পরে স্বামী শিবানন্দ; কালী, পরে অভেদানন্দ—সঙ্গে করে ঘুরে এল বুদ্ধগয়া।

ফিরে এসে কয়েক সপ্তাহের জন্য করল হেডমাস্টারি। চাঁপাতলায় মেট্রোপলিটন ইনমটিটিউশনের একটা শাখা ছিল। সেখানে।

ইংরেজি ১৮৮৬ সাল সেটা। এই বছর আগস্ট মাসের ১৬ তারিখ শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যু হল। নরেনকে তিনি ভালোবাসতেন। স্নেহ করতেন। তাকে না দেখতে পেলে অধীর হতেন। সেই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চলে গেলেন!

৫

মনের মধ্যে একটা অশান্তি বহু দিন ধরেই ছিল। ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া-আসা করত নরেন্দ্র। সেখানে গান গাইত।

আলাপ হয়েছিল অনেকের সঙ্গে। রবি ঠাকুরের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও। একবার তো সোজা গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল। 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?'

জবাব দিতে পারেননি মহর্ষি।

সেই একই প্রশ্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে করাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। এই তোকে যেমন দেখছি, তাঁকেও দেখেছি। বলিস তো তোকেও দেখাতে পারি।'

'বলেন কি?'

তারপর একবার যেই ছুঁয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে, অমনি কী যে হল।

'থাক। থাক। ঈশ্বর দেখে আমার কাজ নেই।'

সেই শ্রীরামকৃষ্ণ, পরমবন্ধু পরমহংসদেব চলে গেলেন।

নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে সংসারে থাকবে না। সন্ন্যাস নেবে।



নিলও সে।

বরাহনগর মঠে অনুষ্ঠান করে সন্ন্যাসগ্রহণ করল। নাম হল স্বামী বিবিদিষানন্দ।

তারপর।

দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়লেন স্বামী বিবিদিষানন্দ ওই যার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাকনাম বিলে। এবার বেশি দূর নয়।

শিমুলতলা। বৈদ্যনাথধাম। কাশী।

কাশী গিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখল। তাঁর কথা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বহুবার শুনেছে। আরও দেখল সেই কাশী, বারাণসীধাম

যেখানে মিলেছে গোটা ভারতবর্ষ। সেখানে মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙালি, গুজরাতি, মারাঠী, হিন্দুস্থানী সব ভাষার, সব আচারের লোক আছে। সবাই মিলেছে এসে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে।

ফিরে এসে স্বামীজী সন্ন্যাসী ভাইদের বলতে লাগলেন, ভারতবর্ষকে দেখতে হবে। বুঝতে হবে। লক্ষ কোটি নরনারীর জীবনে কী ব্যথা, কী বেদনা, কিসে তাদের সুখ, কিসে তাদের দুঃখ জানতে হবে। না জানলে জীবন ব্যর্থ, অপূর্ণ থেকে যাবে।

হাতে দণ্ডকমণ্ডলু আর পায়ের নীচে সর্ষে লাগিয়ে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে লাগল স্বামী বিবিদিষানন্দ। অযোধ্যা। আগ্রা। বৃন্দাবন। ভাগলপুর। বৈদ্যনাথধাম। কর্ণপ্রয়াগ। বদরিকা। রুদ্রপ্রয়াগ। আলমোড়া। শ্রীনগর। হরিদ্বার। হৃষিকেশ। সাহারানপুর। মীরাট। দেখো। ভারতবর্ষকে দেখো। চেনো। বোঝো। এরকম ঘুরতে ঘুরতে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। কত কী জানা হল। শেখা হল।

আগ্রায় তাজমহল, মোগল দুর্গ দেখে বৃন্দাবনের পথে চলেছে। এমন সময় দেখে পথের ধারে একটা লোক নিশ্চিন্তে তামাক খাচ্ছে।

ছোটবেলা থেকে তামাক খাওয়ার অভ্যেস। 'দাও তো ভাই এক ছিলিম।'

'মহারাজ, আমি মেথর। আমার হাতে তামাক খাবেন?' স্বামীজী হাত বাড়িয়েছিলেন। গুটিয়ে নিলেন চলতে লাগলেন নিজের পথে।

খানিক পরে খেয়াল হল, 'তাইতো! আমি না সন্ন্যাসী। জাতপাত সব বিসর্জন দিয়েছি। ছি! ছি।'

তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন।

'ভাই। কিছু মনে করো না। তামাক না খেলে আর আমি বাঁচব না। দাও, দাও। এক ছিলিম তামাক দাও।' কী আর করে সে বেচারা! দিতে হল।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ঘটনাটা তিনি মনে রেখেছিলেন। সুযোগ পেলে শিষ্যদের শোনাতেন। বলতেন আত্ম অভিমান ত্যাগ না করলে মানুষের সেবা করা যায় না। দেশের কাজও করা যায় না। দেশ যে মানুষকে নিয়ে।

দেশ ভ্রমণ করছেন। মানুষ দেখছেন। শিখছেন। এরই ভেতর খবর পেয়েছেন বোন আত্মহত্যা করেছে। কষ্ট পেয়েছেন। পাবেনই তো। ভাইবোনদের কত যে ভালবাসতেন। রাতে শোওয়ার সময় তাদের কত মজার মজার গল্প বলতেন।

এই যেমন—

একবার এক ব্যাঙের বাড়ি খুব যজ্ঞি। কিন্তু তাদের পয়সা গেছে ফুরিয়ে। কী করে? ব্যাঙ কর্তা ভাই মশাদের বাড়ি গেল। আমাদের বাড়ি যজ্ঞি হবে। অনেক লোক খাবে। তোমাদেরও নেমন্তন্ন। তা তোমরা আমায় কিছু কড়ি ধার দাও। মশারা ব্যাঙ-কর্তাকে কিছু কড়ি ধার দিল। ব্যাঙ-কর্তা কড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যজ্ঞি করল।

তারপর বর্ষাকাল এল।

মশারা ব্যাঙ-কর্তার বাড়ি এসে বলতে লাগল, 'কঁড়ি দাঁও, ভাঁই, কঁড়ি দাঁও ভাঁই।'

ব্যাঙ তখন খেয়েদেয়ে খুব মোটা হয়েছে। জলে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে। মশারা সেখানে যেতে পারে না। তারা ওপর

থেকে বলতে লাগল, ‘কঁড়ি দাঁও ভাঁই। কঁড়ি দাঁও ভাঁই।’

ব্যাঙ-কর্তা পেট ফুলিয়ে বলতে লাগল, ‘কে কার কড়ি নিয়েছে! কে কার কড়ি ধারে?’

মশারা তো হতভম্ব।

তারা গাছের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিকটা পরে একটা সাপ এল। সে ব্যাঙটাকে ধরে খানিকটা গিলে ফেলল।

ব্যাঙের তখন প্রায় দমবন্ধ। সেই অবস্থায় পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল, ‘কড়ি নাও, কড়ি নাও, কড়ি নাও।’

মশারা গাছ থেকে তা শুনতে পেয়ে বলতে লাগল, ‘এখন সাপের পেটে যাও। এখন সাপের পেটে যাও।’

কোনোদিন আবার ভাই-বোনেরা আবদার ধরত। ‘ও দাদা, তুই আঙুল দিয়ে ছায়াবাজি কর-না।’

ঘরে পিলসুজের ওপরে মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করছে। তার সামনে নরেন্দ্রনাথ দু হাতের আঙুল জড়িয়ে সামনের দেওয়ালে ছায়া ফেলে। কখনো সেই ছায়া হত উড়ন্ত বাদুড়, কখনো-বা ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার, কখনো-বা দুর্গা-কার্তিক-লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ।

৬

সেবার গিয়েছিলেন উত্তর ভারত। এবার চললেন দক্ষিণ ভারত। আর পশ্চিম ভারত। আলোয়ার। জয়পুর। আজমীর। আবু পাহাড়। বেলগাঁও। মাড়গাঁও। ব্যাঙ্গালোর। ত্রিচুর। ত্রিবান্দ্রম।

মাঝখানে একবার নাম বদল করলেন। ছিলেন স্বামী বিবিদিষানন্দ। হলেন স্বামী সচ্চিদানন্দ।

তা এই রকম ঘুরতে ঘুরতে ত্রিবান্দ্রম থেকে এসে পৌঁছলেন কন্যাকুমারিকায়। তখন শীতকাল। ডিসেম্বর শেষ হতে চলেছে।

কন্যা কুমারিকায় সমুদ্রের বুকের ওপরকার শিলাখণ্ডে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন স্বামী সচ্চিদানন্দ। লাভ করলেন নতুন বোধি। নতুন জ্ঞান। দেখবার নতুন চোখ।

পরের বছর ঘুরতে ঘুরতে ক্ষেত্রীতে। সেখানকার মহারাজ তাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। মহারাজের পুত্রসন্তান হয়েছে। সেই উপলক্ষে উৎসব।

গেলেন তিনি। রইলেন কিছুকাল। ক্ষেত্রীর মহারাজের অনুরোধে নাম বদল করলেন। হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এর পরে আর নাম বদল করার দরকার হয়নি। গোটা পৃথিবী তাঁকে এই নামেই চিনেছে।

৭

পশ্চিম ভারত ভ্রমণকালে এক বালকভক্তের সাহায্যে আলাপ হয়েছিল লিমড়ি-রাজ ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে। ঠাকুর সাহেব তো তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ। তাঁর ইচ্ছে স্বামীজী পাশ্চাত্যে যান। সাহায্য যা করার ঠাকুর সাহেবই করবেন।

পরের বছর জুন মাসে গেলেন পুণেতে। সঙ্গে ঠাকুর সাহেব। সেখানে এল্লাপা বলরামের অতিথি হলেন।

কদিন ধরে চলল আলাপ-আলোচনা।

এর আগে দক্ষিণভারতে যেখানে যেখানে গেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। সে বক্তৃতা যারা শুনেছে তারাই মুগ্ধ হয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর প্রতিভা আর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। সকলেরই ইচ্ছে স্বামীজী শিকাগো মহাধর্মসম্মেলনে যোগ দিন। রাজা-মহারাজা-নবাব, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—কে নেই সেখানে।

স্বামীজীর এক কথা, 'সময় হয়নি।'

একদিন শিষ্য পেরুমলকে ডেকে বললেন, 'মায়ের যদি ইচ্ছে হয় একান্তই, তাহলে আমাকে যেতেই হবে। তবে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে যাব না। যাব জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে। এখন দেখতে হবে এই যাওয়াতে সাধারণের সম্মতি আছে কি না। তোমরা তাই রাজা-মহারাজাদের কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে সাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করো।'

ইতিমধ্যে একদিন স্বামীজী স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। আর তাঁকে বলছেন পেছন পেছন আসতে।

মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। দ্বিধা রইল না। সমুদ্রপারের দেশে তাঁকে যেতেই হবে। যাবই। আমি যাবই।

কিন্তু মাকে না জানিয়ে যাবেন? মায়ের মতটা নেবেন না?

যেমন ভাবা তেমন কাজ। মাকে চিঠি লিখলেন। 'মা আমি শিকাগো মহাধর্মসম্মেলনে যেতে চাই।'

নরেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে মা আনন্দে আত্মহারা। প্রথমটায় মনে হল, সংসারের কিছুই জানে না তাঁর ছেলে। কী করে রাজি হই? কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিতে হল অনুমতি।

মায়ের সম্মতি এসে গেছে। মা রাজি হয়েছে। আর কোনো ভয় নেই।

৩১ মে। ১৮৯৩। বোম্বাই থেকে পেনিনসুলার জাহাজ ছাড়ল। স্বামী বিবেকানন্দ সেই জাহাজের যাত্রী।

কোথায় যাচ্ছেন।

আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে।

এই যাওয়ার এক বছর আগে বোম্বাইয়ের—এখনকার মুম্বাইয়ের—গোয়েন্দা পুলিস রিপোর্ট দিয়েছিল সরকারকে। তাতে লেখা ছিল :

> বিবেকানন্দ উপাধিধারী এই লোকটার আসল নাম জানা যায়নি। যা খবর পাওয়া গেছে, তিনি কলকাতার লোক। সেখানকার চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড স্কুলে পড়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. বি. এল ডিগ্রী নিয়েছেন। তবে সেটা সন্দেহজনক। তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি। খুব শক্ত চেহারা। ডান দিকের কপালে কাটা দাগ আছে। খুব চালাক। সন্ন্যাসী হলেও রাজনীতিতে আগ্রহ আছে।

৮

অনেক দেশ ঘুরে চলল জাহাজ। এক-এক দেশে জাহাজ থামে আর স্বামী বিবেকানন্দ সে-সব দেশ দেখে নেন।

এমনি করে দেখা হল কলম্বো। সিংহলের রাজধানী। সিংহল হল এখনকার শ্রীলঙ্কা।

দেখে নিলেন দক্ষিণে চীনের রাজধানী ক্যাণ্টন। ক্যাণ্টনে ছিল কতকগুলো বৌদ্ধ মঠ আর সবচেয়ে বড়ো মন্দির। দেখলেন।

আর দেখলেন প্রাচ্যের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্যের চুষে খাওয়া। মানুষের দুর্বিষহ কষ্ট।

দেখলেন সুন্দরী জাপান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির মতো শহর। দেখে মন ভরে গেল। চিঠি লিখলেন সেখান থেকে এক মাদ্রাজী শিষ্যকে :

> জাপানীদের সম্বন্ধে এত কথা মনে আসছে যে ছোট্ট চিঠিতে তাদের ভরে দেওয়া শক্ত। শুধু এইটুকু বলতে পারি আমাদের দেশের যুবকরা যেন দলে দলে প্রতিবছর চীন-জাপান যায়। জাপানে যাওয়া বিশেষ দরকার।
>
> দেখে যাও জাপান। সারা জীবন শুধু বাজে বকছ আর বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ। ভাবছ কী করে কেরাণী হবে।
>
> এসব ভাবনা ছাড়ো। মনটাকে বড়ো করো। মানুষ হও। দেখো, আর সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালোবাস না? দেশকে ভালোবাস না? যদি ভালোবাস তবে নিজেরা ভালো হবার প্রাণপণ চেষ্টা করো। পেছনে চেয়ো না। আত্মীয়পরিজন কাঁদবে? কাঁদুক। ভারতমাতা এইরকম হাজার হাজার যুবক চান। মনে রেখো, মানুষ চাই। পশু নয়।

জাপান থেকে ভ্যাঙ্কুবার। সেখান থেকে ট্রেনে তিন দিন পরে শিকাগোয়। অচেনা অজানা দেশ। গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী দেখে সকলে কৌতূহলী হয়ে উঠল। কে ইনি?

ছোট ছেলেরা তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। তার ওপর যে পারছে তাঁকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এক হোটেলে উঠে একটু হাঁপ

ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! হাতের পয়সা ফুরিয়ে আসছে।

ট্রেনে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি তাঁকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিলেন।

তাতে একদিকে লাভ হল আর একদিকে সহ্য করতে হল মানসিক অত্যাচার। মহিলা বন্ধুবান্ধবদের ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলেন ভারত থেকে আসা এই নবীন সন্ন্যাসীকে। সব দেখেশুনে এক-একবার তাঁর মনে হল দরকার কি ধর্মসম্মেলনে বক্তিমে করবার। তার চেয়ে বরং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

পরক্ষণেই আবার মনে হয়, তা কেন? যে পণ করে এসেছি তা সফল না করেই ফিরে যাব? কিছুতেই না।

৯

চারশো বছর আগে ক্রিস্টোফার কলম্বাস নামে এক পৃথিবী পরিব্রাজক আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা দেশটা। ব্যাপারটা মনে করিয়ে দেবার জন্য আয়োজন হয়েছে এক বিশ্বমেলার— শিকাগো শহরে লেক মিশিগানের তীরে। মেলার প্রধান আকর্ষণ আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকা কেমন উন্নতি করেছে তাই দেখানো।

আর সেই সঙ্গে বিশ্বধর্মসম্মেলন।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম কেন? তার আবার কী দরকার? দরকার একটা আছে।

পৃথিবীর যাবতীয় মহান ধর্মগুলোকে এক রঙ্গমঞ্চে এক

জায়গায় করা। বিভিন্ন ধর্মে কী ঐক্য আছে, মিল আছে গোটা দুনিয়ার সামনে তা তুলে ধরা। একবার দেখে নেওয়া এক ধর্ম আর এক ধর্মকে সহ্য করতে পারে কি না। মেনে নিতে মনে নিতে পারে কি না। কয়েক বছর ধরে চলল ধর্মসম্মেলনের তোড়জোড়। একটানা সতেরো দিন ধরে সভা চলবে। সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে। চাট্টিখানি কথা!

দশ হাজার মানুষকে নেমন্তন্ন করা হল। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান জুডা তাও কনফুসিয়ান শিন্তো জোরোয়াস্ট্রিয়ান ক্যাথলিক গ্রীক চার্চ প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রতিনিধিদেরও আহ্বান করা হয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩।

শিকাগোর আর্ট ইনসটিটিউটে শুরু হল বিশ্বধর্মসম্মেলন। সকাল দশটায় ঘণ্টাধ্বনি করা হল দশবার। মস্ত বড়ো ঘণ্টা। তার গায়ে আবার খোদাই করা : 'তোমাদের কাছে আমার নতুন নির্দেশ—পরস্পরকে ভালবাসো।'

মঞ্চের ওপর উঁচু এক সিংহাসনে বসেছেন কার্ডিনাল গিবনস—আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বিশপ। তাঁর দুপাশে কাঠের চেয়ারে বসেছেন হোরিন টাকি, আর. শিবাটা, অনাগারিক ধর্মপাল, দাদাভাই ভারুচি, মুনি আত্মারামজী, বীরচাঁদ গান্ধী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পুঙ্ কুয়াঙ্ ইউ, মহম্মদ ওয়েব, ডি. লাটাস।

আর বিবেকানন্দ? তিনিও বসেছেন একটা চেয়ারে। সকলের চেয়ে বয়সে ছোট। মাত্র তিরিশ বছরের যুবক। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি।

সামনে বিশাল জনতা। পড়ালেখা করা সব মানুষ। তাদের সামনে এক-এক করে বলে গেলেন গ্রীক চার্চের প্রতিনিধি। প্রতাপ মজুমদার। পুঙ্ কুয়াঙ্ ইউ। অনাগারিক ধর্মপাল।

তারপর ডাক পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের।
'এবার আপনি।'
'আমি? আমার নম্বর তো একত্রিশ।'
'তা হোক। এখনই বলুন আপনি।'
'না এখন নয়। পরে বলব।'

বিশ্বধর্মসম্মেলন বলে কথা। তাই সকলেই এসেছিলেন তৈরি হয়ে। বক্তৃতা লিখে এনেছিলেন সঙ্গে করে। আর স্বামী বিবেকানন্দ? তাঁর কাছে নেই কোনো লেখা কাগজ।

বিকেলের সভায় আর সকলের বলার পর তিনি বলতে উঠলেন। কী দীপ্তদৃঢ় দাঁড়াবার ভঙ্গি! কী সুন্দর প্রকাশ। চোখে প্রেম আর প্রার্থনা জ্বলছে কী যেন এক পবিত্রতায়। প্রথম সম্ভাষণ সমবেত শ্রোতাকে—

'ভদ্রমহোদয়া এবং ভদ্রমহোদয়রা' নয়। তবে কী বললেন?



'সিস্টার্স অ্যাণ্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা।'

'হে আমার আমেরিকাবাসী ভাইবোনেরা।'

তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে এই কথা শুনে শ্রোতারা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। এ তো শুধু মুখের কথা নয়। এ যে প্রাণের কথা! তাইতো কথাগুলো, প্রথম সম্ভাষণ তাদের মন ছুঁয়ে গেল। করতালির পর করতালি।

এক মিনিট। দু মিনিট। তিন মিনিট। করতালি যে আর থামতে চায় না!

থামার পর স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'আপনারা আমাদেরকে যে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসীসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবরকম ধর্মের জননী সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে আর সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ থেকে আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

'এই সভামঞ্চে কিছু বক্তা প্রাচ্যদেশের প্রতিনিধিদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে এই সব দূরদেশ থেকে আসা মানুষরাও অন্যদের মত সহ্য করবার আদর্শ বিভিন্ন দেশে বয়ে নিয়ে যাবেন। এঁদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই।'

'যে ধর্ম গোটা দুনিয়াকে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সকল মতের সর্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই ধর্মের মানুষ বলে অহংকার হচ্ছে। ধর্ম সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলে বিবেকানন্দ শেষ করলেন এই কথায় :

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং তার ফলস্বরূপ উন্মত্ত ধর্মান্ধতা বহুকাল এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেছে। এরা

জগতে হিংস্র উপদ্রব করেছে, বারবার পৃথিবীকে মানুষের রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে, মানব সভ্যতাকে নষ্ট করেছে এবং এক একটা জাতিকে নৈরাশ্যে ডুবিয়ে মেরেছে। এই ভয়ঙ্কর দানব যদি না থাকত তা হলে মানবসমাজ এখনকার থেকে অনেক বেশি উন্নত হত। ওদের মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে আর আমি সর্বান্তঃকরণে ভরসা করি, এই মহাসমিতির উদ্‌বোধনে আজ প্রভাতের যে ঘণ্টাধ্বনি হল, তা ধর্মোন্মত্ততার মরণবার্তা জগতে ঘোষণা করুক; একই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তরোয়াল বা কলম দিয়ে অন্যকে পীড়নের দুর্মতির অবসান হোক।

তারপর ওই ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ আরও অনেকগুলো বক্তৃতা দিলেন নানা দিনে। সব শেষ দিনে, ২৭ সেপ্টেম্বর, তিনি বললেন, 'খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলো নিয়ে পুষ্টিলাভ করবে, নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি অনুসারে বেড়ে উঠবে।

যদি এই ধর্মমহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করে থাকে তো এই যে সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটা বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করেছেন।

'এইসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখেন যে অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে আর তাঁর ধর্মই টিঁকে থাকবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁকে আমি স্পষ্ট করেই বলছি, তাঁর মতো মানুষের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লেখা হবে : বিবাদ

নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

১০

তারপর।

তারপর চলল একটানা বক্তৃতা দেওয়া। ধারাবাহিক ক্লাস নেওয়া। বন্ধু আর শিষ্যস্থানীয়দের অজস্র চিঠি লেখা।

এদিকে শিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্যের খবর পেয়ে আনন্দে খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁকেই না একদিন নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?'

ঠাকুর এস্টেটের উকিল ছিলেন বিবেকানন্দের এক কাকা তারকনাথ দত্ত। সেই কারণে দত্ত পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের জানাশোনা ছিল। তারকনাথের কাছে লোক মারফত চিঠি লিখে পাঠালেন দেবেন্দ্রনাথ। সে চিঠি পরে হারিয়ে গেলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না কী লেখা ছিল তাতে।

রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখলেন। নাম 'উপনিষদ ও স্বামী বিবেকানন্দ'। এই প্রবন্ধের গোড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের সারসংক্ষেপ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বললেন, 'উপরে যাহা বিবৃত করিলাম, তাহা খ্যাতনামা হিন্দু ধর্মপ্রচারক বিবেকানন্দস্বামীর বক্তৃতার অন্তর্গত কিয়দংশের তাৎপর্যার্থ ও সারমর্ম। তাঁহার সহিত কোনো

কোনো বিষয়ে আমাদের অনৈক্য থাকিলেও মূলে তাঁহার মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।'

কলকাতার নাগরিকরা, স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ের খবর পেয়ে, বাগবাজারের মদনমোহন জিউ-এর নাটমন্দিরে অভিনন্দনসভার আয়োজন করল। তার কিছুদিন পরে, কলকাতার টাউন হলে হল তাঁর অভিনন্দন সভা।

১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ পুরো তিনটে বছর স্বামী বিবেকানন্দ রয়ে গেলেন বিদেশে। বক্তৃতা দিচ্ছেন। ক্লাস নিচ্ছেন। গল্প বলছেন। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। কখনো কখনো দিনে সাত থেকে আট ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে হয়েছে।

কী বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিতেন তিনি? বিষয়ের কি আর শেষ আছে! হিন্দুধর্ম। ভারতের ধর্মসমূহ। পুনর্জন্ম। ভারতের রীতিনীতি। ঈশ্বরপ্রেম। মানুষের দেবত্ব। ভারতীয় নারী। বুদ্ধ। এই সমস্ত বক্তৃতা পরে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ নামে বই হয়ে প্রকাশ পায়।

দু-একটা বক্তৃতার অংশবিশেষ শুনে নেওয়া যেতে পারে :

> আমাদের প্রধান কাজ নিজেকে ঘেন্না না করা। উন্নত হতে গেলে প্রথম কাজ নিজের ওপর অগাধ আস্থা; সেই সঙ্গে প্রয়োজন ঈশ্বরে বিশ্বাস। যার নিজের ওপর বিশ্বাস নেই, তার কখনোই ঈশ্বরে বিশ্বাস আসতে পারে না। কর্তব্য আর সদাচার অবস্থাভেদে আলাদা আলাদা। এটা স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অন্যায়ের প্রতিকার করলে সবক্ষেত্রেই যে ন্যায় করা হল—তা নয়। কিন্তু অবস্থা অনুযায়ী অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই মানুষের কর্তব্য হতে পারে।...

যে দুর্বল, প্রতিকারে অক্ষম সে কোনো অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারে না। প্রতিকারের ইচ্ছে নেই বলে প্রতিকার করে না তা ঠিক নয়। আবার কেউ কেউ আছে ইচ্ছে করলে সে সাংঘাতিক আঘাত করতে পারে কিন্তু তবুও সে আঘাত করে না। শুধু করে না তাই নয়, বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে। দুর্বলতাবশত যে ব্যক্তি প্রতিকার করছে না, সে পাপ করছে।...

সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার কিছুকাল পরে সুখদুঃখ যা-কিছু আছে ভোগ করে যখন শেষ করে আনবে তখনই বৈরাগ্য আসবে। আসবে শান্তি। কাজেই প্রভুত্ব লাভের বাসনা এবং অন্যান্য যা বাসনা আছে সবই সময় থাকতে পূরণ করে নাও; এ সব বাসনা মিটে যাওয়ার পর এমন এক সময় আসবে যখন জানতে পারবে এগুলো খুবই ছোট জিনিস। কিন্তু যত দিন না তোমার বাসনা মিটছে, যত দিন না তুমি এই ক্রিয়াশীলতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছ, তত দিন তোমার পক্ষে এই আত্মসমর্পণ ও বৈরাগ্যের ভাব লাভ করা অসম্ভব। এই 'প্রশান্তি' হাজার হাজার বছর ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে; সবাই ছেলেবেলা থেকেই এ সব শুনে আসছে, তবুও ওই অবস্থায় পৌঁছেছে এমন লোক জগতে খুব কমই দেখা যায়। আমি তো পৃথিবীর অর্ধেক প্রদেশ ঘুরে বেরিয়েছি, কিন্তু আমার জীবনে যথার্থ শান্ত ও প্রতিকার চেষ্টাশূন্য মানুষ কুড়িজনও দেখেছি কি না সন্দেহ।

সবারই কাজ—নিজের নিজের আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত

করার চেষ্টা করা। অন্য লোকের আদর্শ নিয়ে সে-অনুসারে জীবন গঠনের চেষ্টার তুলনায় নিজের নিজের আদর্শকে জীবনে পরিণত করার চেষ্টায় বরং উন্নতি হতে পারে। এবং এটাই উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়।

১১

১৮৯৬-এর ১০ নভেম্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন লণ্ডনে লেডি ইসাবেল মার্গেসন-এর ৬৩ সেণ্ট জর্জেস রোডের বাড়িতে বক্তৃতা দিতে। সেখানে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছেন মিস মার্গারেট নোবেল। তাঁর পিতা ছিলেন যাজক। অল্প বয়সে মার্গারেট অনেক বিচ্ছেদ আর মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিলেন। বহু কষ্ট পেয়েছিলেন। তা বলে তিনি দমে যাননি। ভেঙে পড়েননি। নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন মানুষের সেবায়। ইস্কুলে পড়াতেন। সাহিত্যসেবা করতেন। পত্রপত্রিকায় লিখতেন নানা বিষয়ে। আবার সেই সঙ্গে কখনো কখনো শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে তাদের সেবা করতেন। চার্চের সেবার কাজে অংশ নিতেন। কিন্তু মন ভরত না। দেখলেন দরিদ্রসেবার নাম করে চার্চ কেবল তাদেরই দান ও দক্ষিণা পাঠাবার নির্দেশ দিচ্ছে যারা চার্চের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। দেখেশুনে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান থেকে—ধর্ম থেকে নয়—নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

এইরকম অবস্থায় মার্গারেটের সঙ্গে দেখা হল স্বামী বিবেকানন্দের। সেই প্রথম দেখার কথা মার্গারেট লিখে রেখে

গেছেন (অবশ্য তখন তিনি আর মার্গারেট নোবেল নন, তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছে : ভগিনী নিবেদিতা)।

নিবেদিতা লিখেছেন :

সময়টা ছিল নভেম্বর মাসের এক রবিবারের শীতল অপরাহ্ন। স্থান ওয়েস্ট-এণ্ড-এর এক ড্রয়িংরুম। আধা গোল হয়ে বসা শ্রোতাদের দিকে মুখ করে তিনি বসেছিলেন। তাঁর পেছনে ছিল ঘরে আগুন রাখবার জায়গা। তাতে জ্বলন্ত আগুন। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। মাঝেমধ্যে উত্তরটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সুর করে আবৃত্তি করছিলেন। গোধূলি ও অন্ধকারের মিলনজাত সেই দৃশ্য নিশ্চয় ভারতের কোন উদ্যানে অথবা সূর্যাস্তকালে কুয়োর কাছে, কিংবা গ্রামের উপকণ্ঠে গাছের তলায় কোন সাধু এবং তার চারদিকে সমবেত শ্রোতার দল বসে আছেন—এইরকম এক দৃশ্যেরই কৌতুককর রূপান্তর বলে তাঁর মনে হয়ে থাকবে। ইংলণ্ডে আচার্য হিসেবে স্বামীজীকে আমি আর কখনো এমন সাদাসিধে ভাবে দেখিনি। তিনি সবসময় বক্তৃতা দিতেন; বা নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রশ্নগুলো সমাগত বহু সংখ্যক শ্রোতার মধ্যে থেকে কেউ কেউ নিময়মাফিক তুলতেন। কেবল এই প্রথমবারেই আমরা মাত্র পনের-ষোল জন নিমন্ত্রিত ছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই আবার ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্বামীজী আমাদের মধ্যে বসে ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল গেরুয়া পোশাক আর কোমরবন্ধ—যেন তিনি আমাদের কাছে কোন এক সুদূর দেশের বার্তা বহন করে এনেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি এক

অদ্ভুত অভ্যাসমত 'শিব! শিব!' বলে উঠছিলেন। তাঁর প্রশান্ত মুখে বিরাজ করছিল কোমল আর মহত্ত্বময় ভাবের মিশ্রণ যা সাধারণত ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিদের মুখমণ্ডলেই দেখা যায়। সম্ভবত ওই ভাবই মহান শিল্পী র‍্যাফেল তাঁর দিব্য শিশুর ললাটে এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে শুনতে নিবেদিতা তাঁর অনেকটা কাছে এসে পড়েন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতাকে তিনি বলেন, 'স্বদেশের নারীদের কল্যাণে আমার কতকগুলো সংকল্প আছে। আমার মনে হয় সেগুলোকে কাজে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পার।' কিছুকাল পরে এক বন্ধুর সঙ্গে নিবেদিতা যান স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। তাঁকে বলেন, 'আপনার কাজে যোগ দিতে আমার আগ্রহ আছে।'

২৮ জানুয়ারি ১৮৯৮।

নিবেদিতা কলকাতায় উপস্থিত হলে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে।

সেই যে এলেন, তারপর থেকে নিবেদিতা রয়ে গেলেন এদেশে। পরাধীন ভারতবর্ষে। নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিলেন ভারতের সেবায়। থাকতে লাগলেন উত্তর কলকাতার বোস পাড়া লেনের এক নগণ্য বাসভবনে। যৎসামান্য আহারগ্রহণ আর সারাদিন করেন স্কুল আর লেখার কাজ। অনুবাদ।

কলকাতায় দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। দেখা দিল প্লেগ।

নিবেদিতা ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অনুগতদের সঙ্গে। প্রাচীন শিল্প নিদর্শনগুলো গভীর মন দিয়ে দেখতে এদেশের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করলেন। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে শিল্পীর দল

গিয়েছিলেন ইলোরা অজন্তা দেখতে।

শুধু কি তাই। বিপ্লবী আন্দোলনে যাঁরা উৎসর্গ করেছেন নিজেদের জীবন, যাঁদের একমাত্র স্বপ্ন ভারতের স্বাধীনতা, ভগিনী নিবেদিতা তাঁদেরও প্রেরণা যোগালেন। দেশের আপামর জনসাধারণের তিনি ছিলেন অত্যন্ত কাছের জন। প্রাণের বন্ধু।

তাঁর সম্পর্কে, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'বিদেশী যাঁরা ভারতবর্ষকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।'

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু : 'অর্ধাহারে আজীবন তিনি আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে প্রাণ দিয়েছিলেন।...ভারতের কল্যাণের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।'

কলকাতায় আসার এক বছর পর নিবেদিতা গিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। তখন কথা উঠেছিল স্বামী বিবেকানন্দের। দেবেন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে বলেন, 'নরেনকে একবার নিয়ে এসো।'

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। ভগিনী নিবেদিতা চললেন স্বামী বিবেকানন্দকে সঙ্গে করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম জানালেন স্বামীজী। দেবেন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে কয়েকটি গোলাপ ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর স্বামীজীকে বসতে বললেন। তাঁর সঙ্গে কথা হল দশ মিনিট।

'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর বিষয়ে:

> নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনোপ্রকার বাধাই ছিল না।

> তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে।...
>
> বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।...তিনি যখন বলিতেন our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না।

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর নিবেদিতা লিখেছিলেন জোসেফিন ম্যাকলাউডকে, 'মনে করো সে সময়ে যদি স্বামীজী লণ্ডনে না আসতেন! জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যেত।'

১২

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ত্যাগ করেন ৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৬। নেপল্‌স্ থেকে প্রথমে আসেন কলম্বোয়। তার পর সেখান থেকে একে একে ক্যাণ্ডি, অনুরাধাপুরম, জাফনা হয়ে প্রথমে এলেন পাম্বানে। সেখান থেকে রামনাদ, মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী,



মাদ্রাজ (এখন অবশ্য নাম চেন্নাই) হয়ে বজবজে পৌঁছলেন।

দিনটা ছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। রাতটা স্টীমারে কাটিয়ে পর দিন সকাল সাড়ে সাতটায় স্পেশাল ট্রেনে উপস্থিত হলেন শিয়ালদহে। সেদিন সেখানে হাজার হাজার মানুষের জনতা। ট্রেন এসে পৌঁছানমাত্র সকলে 'জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়' 'জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়' বলে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। স্বামীজী ট্রেন থেকে নেমে সকলকে যুক্ত করে প্রণাম করলেন। নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে বিবেকানন্দকে মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। স্টেশনের বাইরে ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। যুবকরা গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই টেনে নিয়ে চলল বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ,

শ্রী ও শ্রীমতী সেভিয়ার প্রমুখ যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন—তাঁদের সকলকে। তিনটে তোরণ করা হয়েছিল সুন্দর করে। সেসব পেরিয়ে গাড়ি চলল প্রথমে কাছেই রিপন কলেজে (এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। সেখান থেকে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে। দুপুরবেলাটা সেখানে কাটিয়ে বিকেলে সদলবলে বিবেকানন্দ চললেন কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে।

২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজার রাজবাড়িতে সংবর্ধনা জানানো হল স্বামী বিবেকানন্দকে। হাজার পাঁচেক মানুষ সেদিন হাজির হয়েছিলেন। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব রুপোর পাত্রে অভিনন্দনপত্র স্বামীজীর হাতে তুলে দিলেন। অভিনন্দনপত্র তিনি নিজেই পাঠ করলেন। উত্তরে স্বামীজী যে আবেগদীপ্ত বক্তৃতা দিলেন তাতে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হল। এ যেন এক নতুন মানুষ নতুন সুরে কথা বলছেন। ভারতের শাশ্বত আত্মা যেন মূর্তি ধারণ করে নবীন ভারতকে নতুন আশায় সঞ্জীবিত করবার জন্য অমৃতবাণী, অভয়বাণী উচ্চারণ করছেন।

অল্প কিছুদিন রইলেন তিনি কলকাতায়।

আর বক্তৃতা নয়। মন দিলেন নানা গঠনমূলক কাজে। মঠ, সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। খাটতে লাগলেন প্রচুর। শরীর ধকল সইতে পারল না। ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকজন শিষ্য আর গুরুভাই সঙ্গে করে স্বামীজী চললেন আলমোড়ায় হাওয়া বদল করতে। আড়াই মাস সেখানে রইলেন। তারপর আলমোড়া থেকে বেরিলি, আম্বালা, অমৃতসর, মুরী, শ্রীনগর, রাওয়ালপিণ্ডি, জম্মু, শিয়ালকোট, লাহোর, দেরাদুন, আলোয়ার, খেতড়ি হয়ে যোধপুর। তাঁর মতো এমন করে গোটা ভারতবর্ষ আর কতজন

দেখেছেন? কতজন পেয়েছেন ভারতবাসীর গভীর হৃদয়ের নিখাদ ভালোবাসা শ্রদ্ধা?

দেশভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে চলছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার কাজ। ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮। বেলুড় মঠের উদ্বোধন হল। স্বামীজী এদিন গুরুভাই এবং শিষ্যদের সঙ্গে ভাগীরথীতে অবগাহন করে গেরুয়া বাস পরলেন। ধ্যান উপাসনা পূজা ইত্যাদি সেরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ যে তামার পাত্রে রাখা ছিল সেটা নিয়ে বেলুড় মঠের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হলে সকলকে ডাকলেন। বললেন, এসো আমরা কায়মনোপ্রাণে লোক-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ আমাদের গুরুর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন বহুকাল ধরে এই পবিত্র স্থানে বাস করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছায় একখানা বাঙলা পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন তাঁর বহুদিনের। ১৩০৫ সালের ১ মাঘ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত। পত্রিকার নাম 'উদ্বোধন'। নামকরণ স্বামীজীর। তিনি নিজে পত্রিকার 'প্রস্তাবনা' লিখে দিলেন। ২০ জুন ১৮৯৯।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা করলেন। এবার সঙ্গে আছেন ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী তুরীয়ানন্দ, সতীশ চক্রবর্তী। মাদ্রাজ থেকে সঙ্গী হলেন আলাসিঙ্গা। এবারকার যাত্রায় তিনি গেলেন লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, রিজলি ম্যানর, ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলস, পাসাডেনা, সান ফ্রানসিসকো, এথেনস, মিশর।

সব জায়গায় যথারীতি দিলেন নানা বিষয়ে বক্তৃতা। পেলেন মানুষের উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া। দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

তিনি পত্রাকারে লিখে পাঠাতেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে। সেই রচনাগুলো পরে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলোর মতো জীবন্ত রচনা খুব কমই আছে। একটুখানি দেখলেই টের পাওয়া যাবে :

আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, খবরটা লিখব মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালি 'কিন্তু' বড়ই গোল বাঁধায়। একের নম্বর—কুঁড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখব, মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। ...আমরা কাঠের বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল করে, খোঁটা-খুঁটি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি।...খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাচ করে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের 'সী সিক্‌নেস্' হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের 'গোঁসাইজী' তো কিছুই বলছেন না। বোধ হয়—হয়নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু-ভায়া বলছেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ করে

পাতালমুখো হয়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই—ভালো লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো! কোথায় তোমায় সাতদিন সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা দেব, তাতে কত রঙ ঢঙ মসলা বার্ণিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল-তাবল বকছি!

□

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায়না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশস্য-শ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নিচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে...

□

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। জল-জ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখন দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড ক্লাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর-মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্ ধাড়ার মতো এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ জলে থিক্ থিক্ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা, তীরের মতো এদিক ওদিক করে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়, ওঁর নাম বনিটো। পূর্বে ওঁর বিষয়ে পড়া গেছলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন হুড়ি চড়ে—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদু—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশি হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মতো জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের কাচের মতো জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্চে।

□

আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষীগণ

নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধ-মণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে.সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর!

১৩

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারি মজার মানুষ। পরিচিতজনদের মজার মজার নাম দিতেন।

বেলুড়ে রাম নামে একজন যুবক ছিল। একদিন স্বামীজী বেলুড়ে গেছেন। ছাগল দুইবেন। রামকে দেখেই বললেন, 'ক্যাবলা, ছাগলটা ধরতো, দুইব।' খানিক পরে মনে হল বেচারা হয়তো দুঃখ পেয়েছে ক্যাবলা বলে ডাকার জন্য। সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বললেন, 'নাম একটা নাম মাত্র, যেমন লোকে বলে

বিবেকানন্দ।'

ভক্তিভাবময় প্রেমানন্দ। স্বামীজী তাঁর নাম দিলেন ভেঁপু। বললেন, 'দেখো ভেঁপু, তোমার ওই খালি হায়রে নিতাই, হায়রে নিতাই এ মঠে চলবে না।'

গোপাল ঘোষ নামে এক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হুট করে এসে হুট করে পালিয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ তার নাম দিয়েছিলেন হুটকো। স্বামীজী তার নাম দিলেন হুটকো গোপাল। গোপাল ঘোষের বাড়ির কাছে থাকে সতীশ দত্ত। স্বামীজী তার নাম দিলেন 'মুটকো'।

প্রতাপ হাজরা বলে একজন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু। সবাই বলত হাজরা নরেন্দ্রর 'ফেরেণ্ড'! স্বামীজী তার পদবীর ইংরেজি করেছিলেন 'থাউজেণ্ডা' (হাজার = থাউজেণ্ড + আ)। প্রতাপ হাজরা খুব তর্ক করত। তার উলটো ছিল হরমোহন মিত্র। সবসময় হৈ-চৈ করত। স্বামীজী তাকে বলতেন, 'পাগলা হরমোহন' আর সশব্দ স্বভাবের জন্য নাম দিয়েছিলেন 'হারমোনিয়াম'।

যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যর মুখে ছিল মুসলমানী দাড়ি। যজ্ঞেশ্বরের ডাক নাম ফকির। স্বামীজী নাম দিলেন, ফকিরুদ্দিন হায়দার।

নিজের অনেকগুলো নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে পছন্দ ছিল 'নরেন' নামটা। অশ্বিনীকুমার দত্তকে একবার বলেছিলেন, সে বিবেকানন্দ হবার পরে, 'না, না, নরেন্দ্রনাথ দত্তর মৃত্যু

হয়নি—আমায় ডাকুন, ঐ নরেন নামেই ডাকুন—ঠাকুর যে-নামে আমায় ডাকতেন।'

১৪

খেতে ভারি ভালোবাসতেন বিবেকানন্দ। নেয়াপাতি ডাবের ভেতর চিনি মিলিয়ে বরফ দিয়ে খেতে তাঁর কী যে ভালো লাগত।

জিবে গজা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এক হাঁড়ি জিবে গজা খাওয়া তো তাঁর কাছে নস্যি ছিল।

একদিন একজন গেছে গঙ্গার ধারে বেড়াতে। দেখে আহিরীটোলা ঘাটের দিক থেকে একজন সন্ন্যাসী আসছেন। কে ইনি? কাছে আসতে দেখে তারই গুরু—স্বামী বিবেকানন্দ। দেখে তাঁর বাঁ হাতে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুরভাজা। শিষ্য তো দেখে অবাক। গুরু চানাচুর খাচ্ছে! শিষ্য জিগ্যেস করল, 'গুরুদেব, এদিকে কী মনে করে?

গুরু উত্তর দিলেন, 'এই একটু কাজে এসেছিলুম। চল, তুই মঠে যাবি? চারটি চানাচুরভাজা খাবি! খা না! বেশ নুন ঝাল আছে।'

স্বামী বিবেকানন্দ তখন আমেরিকায় আছেন। বিনা পয়সায় বক্তৃতা করেন। এক জায়গায় অতিসামান্যভাবে থাকেন। একটা ছোট ঘরে তাঁর খাওয়ার জিনিসপত্র, মশলা ইত্যাদি থাকত।

এক সাহেব একদিন সেই ঘরে ঢুকে প্রত্যেকটা জিনিস কী জেনে নিয়ে চেখে দেখতে লাগল। স্বামীজী দেখছেন অথচ কিছু বলতে পারছেন না। কোথায় যেন বাধছে। একটা পাত্রে অনেকগুলো লঙ্কা ছিল। এগুলো কী? স্বামীজী বললেন, 'ভারতীয় কুল।' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে সাহেব এক মুঠো মুখে দিয়ে মরে আর কি। তারপর থেকে সাহেব আর কখনো সে ঘরে ঢোকেনি।

১৫

ছোট ছেলেমেয়েদের বন্ধু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। একজন জানিয়েছেন : "আমার ভাগ্নে-ভাগ্নী—রাম, কেষ্টময়ী প্রভৃতি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বসেছিল। ওদের জন্য আনন্দ করে, মুখে মজার আওয়াজ করে, ছড়া বলতে লাগলেন—'দে দই, দে দই পাতে, ওরে বেটা হাঁড়ি-হাতে। ওদের পাতে মাছের মুড়ো—ওরা কি তোর বাবা-খুড়ো?' ওরা হেসেই খুন।"

মীরাটে যখন গিয়েছিলেন তখন সেখানে আলাপ হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের সঙ্গে। ত্রৈলোক্যনাথের বড় মেয়ে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "বাবা স্বামীজীদের চেয়ে বয়সে বড়, তাই তিনি বাবার সামনে তামাক খেতেন না—বাগানের দিকে এক ধারের ঘরে তক্তপোষের উপর বসে খুব খেতেন। হাসতে-হাসতে বলতেন, 'বাবাকে যেন বলিসনি!' আমাদের দু'বোনকে নিকষা-মাসী, সূর্পনখা-মাসী বলে খেপাতেন। আমরা রেগে গেলে

বলতেন, 'তোরা চটিস কেন? ওঁরা দুজন কি কম? স্বয়ং রামচন্দ্র একজনের নাক কেটেছেন, আর বিভীষণ অন্যজনের ছেলে।' চাটনি পরিবেশনের সময় মজা করতেন, 'দেখিস, দিতে-দিতে যেন লাল পড়ে না যায়'।"

একবার গৌর নামে একটা ছেলে বকাটে হয়ে গিয়েছিল। তার মা তাকে শোধরাবার জন্য মঠে রেখে গিয়েছিলেন। স্বভাব কি আর যায়! রাখাল মহারাজের পকেট থেকে পয়সা চুরি করতে লাগল গৌর।

রাখাল মহারাজ একদিন গৌরকে ধরে নিয়ে গেলেন স্বামীজীর কাছে। 'তুমি গৌরকে আশকারা দাও বলেই ও এমন করার সাহস পায়।'

এদিকে বালক গৌর তো ভয়ে কাঁপছে।

স্বামীজী বললেন, 'দেখ রাখাল। তুই মোহন্ত। সকলকে দেখার ভার তোর ওপর। ও ছেলেমানুষ। ইস্কুলে যায়। টিফিনে অবাক জলপান, নকুলদানা, ঘুগনিদানা খাবার ইচ্ছে তো হবেই যেমন তোর আমার হত ছেলেবেলায়। মাঝে মাঝে দু-চার আনা পয়সা দিয়ে দেখ না চুরি বন্ধ হয় কি না।'

বড়ো হয়ে এ গল্প গৌরবাবু নিজেই বলেছিলেন।

আর একবার মঠের এক বালক ব্রহ্মচারীর হাত থেকে একটা সৌখীন কাঁচের গেলাস পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। স্বামীজীকে একজন ভক্ত সেটা উপহার দিয়েছিলেন। মঠে ছিলেন এক বৃদ্ধ সাধু। তিনি তো সেই বালক ব্রহ্মচারীকে ভয়ানক বকাঝকা করতে লাগলেন।

স্বামীজীর কানে গেল কথাটা। বৃদ্ধকে বললেন, 'অত বকুনির কী আছে! আরে বাবা, কাঁচের গেলাস তো ওই করেই যাবে। তার তো আর কলেরাও হবে না, থাইসিসও হবে না।'

১৬

বিবেকানন্দ বলেছেন : আহা, দেশে গরিবদুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে, হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখেদুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে!

□

ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপদাদার খবর রাখি না।

□

যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?

□

যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।

□

জনগণ আমাদের শিক্ষার জন্যে পয়সা দিয়েছে, মন্দির তৈরি করে দিয়েছে, বিনিময়ে চিরকাল লাথি খেয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে উচ্চবর্ণের ক্রীতদাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

□

ভারতকে যদি তুলতে হয়, তাহলে জনগণের জন্যে কাজ করতেই হবে।

□

আমাদের দরকার—লোহার মতো পেশী আর বজ্রের মতো দৃঢ় স্নায়ু।

□

পরস্পরের প্রতি হিংসাদ্বেষ ছেড়ে এবং পরস্পর ঝগড়া না করে প্রথমেই এই স্বদেশবাসীদের পূজা করতে হবে।

□

যে ভারতে চিরদিন সব সম্প্রদায়ই সম্মানিত হয়ে এসেছেন, সেই ভারতে এখনও যদি এইসব সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর হিংসাদ্বেষ থাকে, তবে ধিক্ আমাদের।

□

আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাকে এই কয়েক বছর ভুললে কোন ক্ষতি নেই।

□

হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই;...সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

□

যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ ভালভাবে শিক্ষিত হচ্ছে, ভালভাবে খেতে পাচ্ছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাদের ভালভাবে যত্ন নিচ্ছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন হোক না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না।

□

মানুষ আর প্রাণী, এরাই আমাদের দেবতা। সর্বপ্রথম আমরা যে দেবতার পূজা করব, তাঁরাই হলেন আমাদের স্বদেশবাসী।

□

যখন তুমি অন্যকে আঘাত কর, তখন তুমি নিজেকেই আঘাত করে থাক, কেন না তুমি আর তোমার ভাই এক।

□

ধর্ম নিয়ে বিবাদ ঠিক খোসা নিয়ে বিবাদের মতো।

□

যা সকলের মধ্যে মিলন ঘটায় তা পুণ্য, আর যা বিচ্ছেদ ঘটায় তা পাপ।

□

বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগ ইচ্ছা ত্যাগ করো।

□

যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।

□

ফেলে দে তোর শাস্ত্রফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস।

□

খালি বইপড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে চরিত্র তৈরি হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।'

□

প্রকৃত সহানুভূতি ছাড়া আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না।

□

সাহস করে দাঁড়াও, নিজেদের ঘাড়েই সব দোষ নাও। অন্যের কাঁধে দোষারোপ করতে যেও না, তোমরা যেসব কষ্ট ভোগ করছ, সেগুলির জন্য তোমরাই দায়ী।

□

মনে করো না তোমরা দরিদ্র। অর্থ বল নয়; সাধুতাই—পবিত্রতাই বল।

□

মরে তো যাবিই; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল।

□

শরীর যতদিন আছে, ততদিন কাজ না করে তো কেউ থাকতে পারে না। সুতরাং যে কাজে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত।

□

প্রত্যেক কাজই পবিত্র। পৃথিবীর কোনো কাজকে নীচ বলার অধিকার তোমার নেই। ঝাড়ুদারের কাজের সঙ্গে সিংহাসনে বসে সম্রাটের রাজ্যচালানোর কাজের মধ্যে ভালমন্দ কোনো পার্থক্য নেই।

□

একরত্তি কাজ বিশ হাজার টন বচনের চেয়ে অনেক দামী।

□

সব কাজেই ভুলভ্রান্তি আমাদের একমাত্র শিক্ষক। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না।

□

মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মতো করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান।

□

শক্তিফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলে আপনাআপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখবি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পারবি নি।

□

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

□

দেশের লোকে দুবেলা দু মুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজান, ঘণ্টানাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া আর নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা।

□

একজন লোকও কেন না খেয়ে মরবে?

□

তুই যদি মনমুখ এক করতে পারিস, কথাও ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনাআপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।

□

যে যত বড় হয়েছে,তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষে মেজে দেখে তবে
তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে।

☐

মরতে হয় একবারই মরবি। কাপুরুষের মতো অহরহ মৃত্যুচিন্তা করে বারে বারে মরবি কেন?

☐

আমরা যেন কখনো আমাদের আদর্শ ভুলে না যাই, কখনো না।

☐

জানবে, কোনো বড়ো কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ছাড়া হয় নি।

☐

যুদ্ধে নেমে পড়ো। পিছু হটো না। আকাশ থেকে নক্ষত্র খসে পড়তে পারে, জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, তবু যুদ্ধ করতে হবে।

☐

যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।

☐

মানুষের জন্ম প্রকৃতিকে জয় করবার জন্যই, তাকে অনুসরণ করার জন্য নয়।

☐

কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড়ো ভাব হৃদয়ে আসে না।

☐

আগে হও মানুষ, তারপর হিন্দু।

□

এই পৃথিবী একটা বিরাট ব্যায়ামাগার, এখানে আমরা আসি নিজেদের সবল করে তুলতে।

□

টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—

□

দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি দুর্বল সবল হয়—অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

□

যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করতে পারে নি, কখনও পারবে না।

□

অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার তোমার চিরকালই আছে।

□

কারো নিন্দা করো না, সাহায্য করতে পারো তো করো।

□

অন্যের নিন্দা করলে কেবল বৃথা শক্তিক্ষয় হয়।

□

কাউকে বলো না 'তুমি মন্দ', বরং তাকে বলো—'তুমি ভালই আছ, আরো ভাল হও'।

□

যদি বেঁচে থাকতে চাও তো নিজেকে যুগোপযোগী করে তোলবার চেষ্টা করো।

□

চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য হয় না।

□

যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে।

□

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত নয়।

১৭

ইউরোপ ভ্রমণ সেরে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরলেন ডিসেম্বরে। মুম্বাই হয়ে বেলুড়ে ফিরে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন। তারপর বছর ফুরবার আগেই বেরিয়ে পড়লেন আবার।

এবার কাঠগোদাম, মায়াবতী, পিলিভিত হয়ে বেলুড়ে ফিরলেন ২৪ জানুয়ারি ১৯০১। ঐ বছর মার্চ মাসে গেলেন ঢাকায়। এপ্রিলে কামাখ্যা দর্শন সেরে গোয়ালপাড়া গৌহাটি।

জাপান যাওয়ার ডাক এসেছিল। শরীর ভালো নয়। জাপান যাওয়া হল না।

মা ভুবনেশ্বরীর ইচ্ছায় একবার কালীঘাট মন্দিরে গেলেন।

নভেম্বর মাসে সিমলায় নিজের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপুজো করলেন।

২৩ ডিসেম্বর কলকাতায় বসল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। সেই উপলক্ষে কলকাতায় এসে বেলুড় মঠ গেলেন

বালগঙ্গাধর তিলক। গিয়েছিলেন আরও অনেক নেতা। স্বামীজী সকলের সঙ্গে হিন্দীতে কথাবার্তা বলেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তখন স্বামীজী বাগবাজারে। ফলে দেখা হল না।

পরের বছর জাপান থেকে এলেন ওকাকুরা আর হোরি। ওকাকুরা ছিলেন মস্ত পণ্ডিত এবং শিল্পী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলত। ওকাকুরা স্বামীজীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বুদ্ধগয়ায়। সেখান থেকে কাশী গেলেন তাঁরা।

এদিকে শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে স্বামীজীর। অসুস্থতার জন্য এ বছর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে যোগ দিতে পারলেন না। আছেন বেলুড় মঠে।

এর মধ্যে একদিন মঠে এলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। অনেক বছর ধরে চেষ্টা চালাচ্ছেন 'শিবাজী উৎসব' করার। সে বছর হবে ঠিক হয়েছে। স্বামীজীর কাছে এসেছেন দেউস্কর তাঁকে এই উৎসবে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ নিয়ে।

শরীর ঠিক নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও না করে দিতে হল সখারামকে।

কিন্তু জননী ভুবনেশ্বরী! তাঁর ডাক কেমন করে ভুলে থাকেন। একদিন দেখা করে এলেন মায়ের সঙ্গে। তারপর ফিরে এলেন বেলুড় মঠে। এই তাঁর নিজের স্থান। এখানেই প্রাণের আরাম তিনি পান।

১৮

৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। এ দিনের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ একটা কবিতা রচনা করেছিলেন : '৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি। ইংরেজিতে লেখা এই কবিতার শেষ লাইন ছিল, মুক্তির দিন! আজিকে সবারে স্বাধীনতা করো দান।

এ হল ১৮৯৮ সালের কথা।

চার বছর পরে ওই একই দিনে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্বামীজী মঠের আর সকলের সঙ্গে ধ্যান করতে গেলেন না। পুরনো দিনের কথা তুলে জুড়ে দিলেন নানান গল্প। দুপুরে বেশ খিদের সাথে ইলিশ মাছের ঝোল, ভাজা ইত্যাদি দিয়ে ভাত খেলেন। তারপর বিশ্রাম সেরে ঘণ্টা তিনেক ক্লাস নিলেন সাধু-ব্রহ্মচারীদের। বিকেলে এক কাপ গরম দুধ আর জলপান করে স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গী করে হাঁটতে বেরলেন। গেলেন বেলুড় বাজার পর্যন্ত।

সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে জপে বসলেন। সেবক ব্রজেন্দ্রকে বললেন, 'না ডাকলে আসবি না।'

ঘণ্টাখানেক পরে ব্রজেন্দ্রকে ডাকলেন। 'দরজা-জানলা খুলে দে। গরম লাগছে।'

বাইরে জমাট অন্ধকার। সামনে বয়ে চলেছে গঙ্গা। আকাশে দেখা যাচ্ছে অগণিত তারা। আত্মমগ্ন বিবেকানন্দ পুবদিকের জানলায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ব্রজেন্দ্রকে বললেন বাইরে বসে জপ করতে। আর নিজে বসলেন পদ্মাসনে জপমালা হাতে।

এক ঘণ্টা পরে আসন থেকে উঠে শোওয়ার ঘরে গেলেন।

রাত তখন নটা।

মেঝেয় বিছানা পাতা ছিল। তার ওপর শুলেন। হাতে জপমালা।

ব্রজেন্দ্রকে মাথায় বাতাস করতে বললেন। ব্রজেন্দ্র বাতাস করতে লাগলেন।

খানিক পরে স্বামীজী বললেন, 'আর বাতাস করতে হবে না। একটু পা টিপে দে।'

ব্রজেন্দ্র তাই করলেন।

স্বামীজীর নিদ্রাবেশ হল। ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটল। এতক্ষণ চিত হয়ে-শুয়েছিলেন। এবার বাঁ পাশে ফিরলেন। ডান হাত একটু কাঁপল। কপালে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। তারপর শিশুর কান্নার মতো শব্দ। মিনিট দুই ওইভাবে থাকার পর গভীর এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মিনিট দুই স্থির। আবার এক গভীর দীর্ঘশ্বাস। মাথাটা নড়ে উঠল তাঁর। চোখ ভুরুর মাঝখানে স্থির হয়ে রইল। মুখে অপূর্ব জ্যোতি আর হাসি।

ধ্যানের পাখায় ভর করে তাঁর আত্মা দেশকালের সীমা পেরিয়ে চলে গেল সেখানে যেখানে থেকে আর ফেরা নেই।

শরীরটা ভাঁজ-করা পোশাকের মতো পড়ে রইল পৃথিবীতে।

১৯

ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দ। সারা ভারতবর্ষ যিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, দেখেছেন ভারতের মানুষকে, তাঁর বিচ্ছেদে সেই ভারত কি চুপ করে থাকতে পারে!

চেন্নাইয়ের একটি মাসিক পত্রিকা শ্রদ্ধা জানিয়েছিল : 'সবচেয়ে

উজ্জ্বল যে তারাটি দশ বছর কি তার বেশি সময় ধরে আপন ঐশ্বর্যময় আলোর গরিমা বিকীর্ণ করে ঈশ্বর ও মানুষের দেবত্ব প্রকাশ করেছিল...সেই মহিমার আকার আর দেখব না, সেই বৈদ্যুতিক বাগ্মিতা আর শুনব না।...তাঁর আদর্শে মহিমা ও কীর্তির বিরাটত্ব সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব।'

উত্তর ভারতের একটি পত্রিকা লিখেছিল : 'জাতিপ্রথায় অবিশ্বাসী তিনি, বন্ধুদের মনে তিনি স্থিরভাবে প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন যে জাতিপ্রথার ভেতর দিয়ে ভারতের উন্নতি চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ চেষ্টা হয়ে দাঁড়াবে।'

স্বামীজীর জীবিতকালে বহু ভারতীয় লেখক তাঁর জীবন ও রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

মলয়ালম কবি কুমারন আসান ষোল বছর যুক্ত ছিলেন এস এন ডি পি আন্দোলনের সঙ্গে। স্বামীজীর ভাবধারাকে তিনি মনেপ্রাণে বরণ করে নিয়েছিলেন। 'বিবেকোদয়ম্' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করলেন তাঁর সংঘের পক্ষ থেকে। এই পত্রিকায় কত-যে স্বামীজীর রচনা তিনি মলয়ালামে অনুবাদ করেছিলেন! স্বামীজীর 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাও তিনি মলয়ালমে অনুবাদ করলেন। আসানের সময়কার কবি শ্রীমুলুর একবার তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' অনুবাদ করার জন্য। আসান তার উত্তরে লিখলেন এক কবিতা। সে কবিতার শেষ স্তবকে ছিল 'কর্মযোগ' প্রসঙ্গ : স্বামী বিবেকানন্দের জাদুকরী বাগ্মিতাশক্তির গৌরবময় সৃষ্টি কর্মযোগ—'আপনার ইচ্ছামতো মলয়ালমে অনুবাদ করে 'চন্দ্রিকা'তে পাঠাব।'

কবি ভাল্লাথোল নারায়ণ মেনন কথাকলি নাচকেই কেরল জগতের সামনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেননি। ভারতের জাতীয়তা ও

স্বাধীনতা আন্দোলনকেও রূপ দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। ভাল্লাথোল 'পান' নামের দ্রাবিড় ছন্দে লিখেছিলেন 'নরেন্দ্রর প্রার্থনা'। বিষয় : নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে গিয়েছিলেন অর্থ প্রার্থনার জন্য। পার্থিব সম্পদ চাইছেন এই লজ্জায় দুবার ফিরে এসে তৃতীয়বার তিনি মা-কালীর কাছে গিয়ে চাইলেন কেবল বৈরাগ্য।

সুব্রহ্মণ্য ভারতী ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, অনুবাদক, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক। তিনি হলেন তামিল সাহিত্যের নবযুগের স্রষ্টা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যোগ থাকার অপরাধে তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এমন কোনো কবি সহ্য করেছেন কি না সন্দেহ। তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ছিল ভগিনী নিবেদিতার। ভারতী দুটি কাব্যগ্রন্থ নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দর উপর তিনি এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন : 'শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংস।' তার এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন যে বাংলার রাজনীতিকরা যাকে অন্ধকার দেশ বলে সেই মাদ্রাজই বিবেকানন্দ-নামের 'আলো'কে আবিষ্কার করেছিল। বিবেকানন্দের ভাবাণুসরণে ভারতী লিখেছিলেন :

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি!
পারিয়ার, তাইয়ার, গুলয়্যার—মুক্তি!
এসো শ্রমের সঙ্গী আমরা সকলে,
বাদ নয় কেউ, নহেকো আঘাত।
আলোকে, সত্যে, পথে গতিশীল
আমরা সবাই, নীচ নয় কেউ, হবে না দমিত,
সবাই মুক্ত যে-আছে ভারতে,
সবাই মহান, জন্মে মহান।

কৃষ্ণাজী নারায়ণ আবল্যে ছিলেন খ্যাতিমান মরাঠি মাসিক পত্রিকা 'কেরল-কোকিল'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তিনি আবার ছবি আঁকতেন। স্বামীজীর প্রয়াণে তিনি লিখলেন, 'এই বর্তমান যুগে, যখন কলির পূর্ণ প্রকোপ, তখন বৈদিক ধর্মের উদ্ধারকর্তা শ্রীমৎ বিবেকানন্দস্বামী কলকাতার কাছে বেলুড় মঠে ৪ঠা জুলাই শুক্রবার রাতে সমাধিস্থ হলেন। এক অদ্বিতীয়, জগৎবন্দ্য ও অবতারপুরুষ চলে গেলেন। এতে যে বিরাট ক্ষতি হল তা কোনোভাবেই পূরণ করা যাবে না।'

কন্নড় কবি কুভেম্পু। তাঁর আসল নাম কে. ভি. পুট্টাপ্পা। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বহু পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। সম্মানিত এই কবি লিখেছেন তাঁর দিনলিপিতে : 'স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা। তিনিই আমাকে পরবর্তী জীবন-রূপান্তরের আদর্শ দিয়েছেন।' তাঁর দিনলিপি থেকে পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের উপর লেখা এই কবিতা :

দর্শনের পুষ্পিত প্রকাশ, বিশ্বরহস্যের মহান আচার্য,
হে অতিকায় অধ্যাত্মপুরুষ, ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সৈনিক,
মহাশক্তির আধার হৃদয় তোমার, হে ঋষিপ্রধান,
সন্দিগ্ধ নিয়তির তরঙ্গে কাণ্ডারী, তোমাকে নমস্কার!
স্বাগত! সুস্বাগত! জয়তু! জয়তু!
অমর কালজ্যোতিতে উদ্ভাসিত তুমি, এই তোমার দুঃসাহসী ভক্ত
তুলবে না আতঙ্কের চীৎকার, কোনো অভিযোগের ক্ষুব্ধ কণ্ঠ,
স্বর্গ-মর্ত্যকে পদতলে রেখে শাসন করবে সে আপন নিয়তিকে।

জ্বলন্ত উল্‌কা বিশাল, স্খলিত হয়েছে পৃথিবীতে,
আলোকিত সর্বপ্রাণী—সে আলোক অতিক্রম করেছে সমুদ্র,
বিস্ময়ে শিহরিত সকলে যারা নিদ্রিত নির্বাক,
উত্থিত নির্নিমেষ নয়নে, বন্দনা করেছে তোমাকে।
ধন্য ধন্য তুমি, দিব্যপথের যাত্রী নেতা,
তোমার প্রাচ্য আলোকে ধৌত পশ্চিম অত্যুজ্জ্বল।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে লিখেছিলেন মুনসী প্রেমচন্দ, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক-ছোট গল্পকার : 'যেসব বিরাট পুরুষ ভারতীয় নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি করেছেন তাঁদের শীর্ষে বিবেকানন্দের স্থান। তাঁর দিব্যবাণীতে কেবল ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের উদ্দীপ্ত ঘোষণা।...স্বামীজী যদিও আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তিনি অধ্যাত্ম-আলোকের যে-শিখা প্রজ্বলিত করে গেছেন তা চিরদিন জগতে জ্যোতিদান করবে।'

প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' ব্যক্তিজীবনে এবং রচনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সমস্ত বাণী ও রচনা তিনি পড়েছিলেন, অনুবাদ করেছিলেন কিছু কিছু আর আত্মস্থ করেছিলেন সমস্তই। নিরালা যখন খুব তেজের সঙ্গে কথা বলতেন তখন জানিয়ে দিতেন, 'আমি যখন এইভাবে কথা বলি তখন মনে করো না যে, আমি নিরালা কথা বলছি। ভেবে নিও, আমার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ কথা বলছেন।'

Printed at M/S Bharat Mudranalaya, Delhi